উদ্ভিদ প্রজনন

Reproduction of Plants

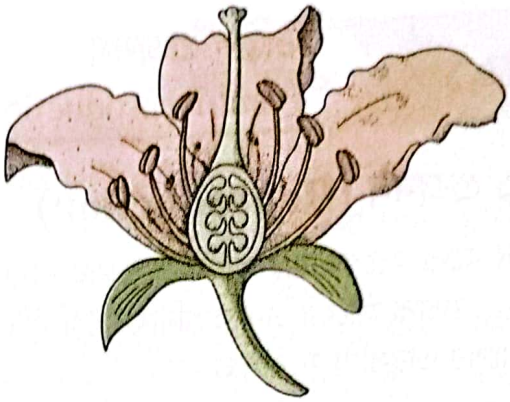

প্রধান প্রধান শব্দ

- জনন
- যৌন জনন
- ত্রিমিলন
- নিষেক
- অযৌন জনন
- অঙ্গজ জনন
- দ্বি-বিভাজন
- পার্থেনোজেনেসিস
- অ্যাপোগ্যামি
- সংকরায়ন
- ইমাস্কুলেশন

প্রজনন জীবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে জীবনের প্রবাহ ধরে রাখতে প্রতিটি জীব নিজের অনুরূপ বংশধর তৈরি করে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে জীবের মৃত্যু ঘটে। এজন্য পৃথিবীতে বংশধরের মাধ্যমে এদের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়। নতুন পরিবেশে টিকে থাকার জন্য জীবের বংশধর শুধু বাবা মায়ের অনুরূপ হলেই চলে না, অভিযোজন উপযোগী হতে হয়। এভাবেই জীবের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখতে প্রজননের মাধ্যমে অভিযোজন উপযোগী বংশধর উৎপন্ন হয়। অঙ্কুরোদগমের মাধ্যমে উদ্ভিদ জীবনের যে সূচনা ঘটে, বৃদ্ধি ও বিকাশ শেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রতিটি জীব প্রজাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বংশবিস্তারের লক্ষে মৃত্যুর আগে এককভাবে বা অনুরূপ জীবের সহায়তায় বংশধর উৎপাদন করে। জীবের বংশধর উৎপাদনের এই আত্মিক প্রবণতাই প্রজনন। অর্থাৎ **যে শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় জীব তার অনুরূপ অপত্য বংশধর সৃষ্টি করে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রজনন**। আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌন প্রজননের উপর একটি বিশেষ শাখা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং তাকে **উদ্ভিদ ভ্রূণবিজ্ঞান** (plant embryology) বলে।

সকল প্রকার উদ্ভিদের (বা জীবের) মধ্যে নানা ধরনের প্রজনন সংঘটিত হতে দেখা যায়। আদিকোষী উদ্ভিদ (ব্যাকটেরিয়া ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া) ব্যতীত প্রায় সকলেরই যৌন প্রজননের তথ্য জানা যায়। তবে অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে অযৌন জননের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি একটি শক্তিশালী কৌশল। এছাড়া অস্বাভাবিক ও আকস্মিক কিছু প্রজনন কৌশল বিচ্ছিন্ন কিছু উদ্ভিদে দেখা যায়। যেমন- অ্যাপোগ্যামি, অ্যাপোস্পোরি এবং পার্থেনোজেনেসিস। তবে একমাত্র যৌন জননধারী উদ্ভিদেই জীবনচক্র তথা সুনির্দিষ্ট **জনুক্রম** (alternation of generation) বিদ্যমান। পাশাপাশি প্রজননবিদগণের প্রচেষ্টায় একাধিক প্রজনকের বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে অধিক অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল, রোগ প্রতিরোধী, পুষ্টিমান সম্পন্ন জাত উদ্ভাবনে সক্ষম কৃত্রিম প্রজনন কৌশলও গড়ে উঠেছে, যা সংকরায়ন (hybridization) নামে পরিচিত।

সকল প্রকার প্রজননের মধ্যে একমাত্র যৌন জননের মাধ্যমেই জেনেটিক ডাইভারসিটি গড়ে ওঠে এবং তা বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার যোগ্য করে তোলে। তবে কিছু ছত্রাক, সায়ানোব্যাকটেরিয়া এবং ব্যাকটেরিয়ায় জেনেটিক ডাইভারসিটি তৈরির জন্য যৌন জনন ব্যতীত ভিন্ন কৌশল আছে, যাকে আমরা প্যারাসেক্সুয়ালিটি, ট্রান্সডাকশন ও ট্রান্সফরমেশন বলে থাকি। এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা আবৃতবীজী উদ্ভিদের প্রজনন নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়া
- বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা
- কৃত্রিম প্রজননের ধারণা
- কৃত্রিম প্রজননের উপায় হিসেবে উদ্ভিদের সংকরায়ন
- কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	উদ্ভিদ প্রজনন
পাঠ ২	অযৌন জনন
পাঠ ৩	উদ্ভিদের কৃত্রিম অঙ্গজ জনন
পাঠ ৪	উদ্ভিদ সংকরায়ন বা উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন

পাঠ ১

উদ্ভিদ প্রজনন
Plant Reproduction

১০.১ প্রজনন (Reproduction)

প্রজনন হলো বংশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিজের অনুরূপ বংশধর উৎপন্ন করার শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি। প্রজনন প্রত্যেক জীবের এক অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। প্রজননের মাধ্যমে প্রজাতির ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষিত হয়।

উদ্ভিদের প্রজনন প্রধানত দু'ধরনের। যথা– ক. **যৌন প্রজনন** ও খ. **অযৌন প্রজনন**।

বিপরীত যৌনধর্মী দুটি গ্যামিটের মিলনের ফলে বংশধর উৎপাদন পদ্ধতিকে **যৌন জনন** (sexual reproduction) বলে। যৌন জনন জীবের মুখ্য প্রজনন পদ্ধতি। যৌন জননের মাধ্যমে উৎপন্ন বংশধর বংশবিস্তারের পাশাপাশি উক্ত প্রজাতির বিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কিছু কিছু উদ্ভিদে গ্যামিটের মিলন ছাড়াই দেহের অংশবিশেষ হতে সরাসরি বংশধর উৎপন্ন হতে দেখা যায়। এরূপ জনন পদ্ধতিকে **অযৌন জনন** (asexual reproduction) বলে। যৌন জননে বংশবিস্তারকারী অনেক উদ্ভিদে নিষেক ছাড়াই ডিম্বাণু হতে ভ্রূণ (n) উৎপন্ন হয় এবং নতুন বংশধর উৎপন্ন করে। এ পদ্ধতিকে বলা হয় **পার্থেনোজেনেসিস** (parthenogenesis) বা **অপুংজনি** । এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন উদ্ভিদে ব্যতিক্রম বিভিন্ন প্রকার জনন কৌশল দেখা যায়।

১০.১.১ যৌন জনন (Sexual Reproduction)

ফুল আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিশেষায়িত যৌন জনন অঙ্গ এবং তা বিশেষভাবে রূপান্তরিত বিটপ। ফুলের পরাগধানীতে উৎপন্ন পরাগরেণু (পুংরেণু) এবং গর্ভাশয়ে উৎপন্ন ডিম্বক যৌন জননে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

এ থেকে পরবর্তীতে যথাক্রমে পুং গ্যামিট (শুক্রাণু) এবং স্ত্রী গ্যামিট (ডিম্বাণু) উৎপন্ন হয়। দু'প্রকার গ্যামিট মিলনের মাধ্যমে প্রথমে বীজ উৎপন্ন করে, যা পরবর্তীতে ভ্রূণ সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়। তবে আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌন জনন প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। সেগুলো নিম্নরূপ-

১. **পুংরেণুস্থলীর বিকাশ (Development of Microsporangium):** ফুলের তৃতীয় স্তবককে পুংস্তবক (androecium) বলে, যার প্রতিটি এককের নাম **পুংকেশর** (stamen)। প্রতিটি পুংকেশরের গোড়া সূত্রাকার বা বৃন্তাকার (filament) আর ঊর্ধ্বাংশ থলির মতো যা পরাগরেণু উৎপাদন করে, এ থলে সদৃশ অংশকে **পরাগধানী** (anther) বলে। প্রতিটা পরাগধানীর ভেতরে পৃথক পৃথক এক বা একাধিক পুংরেণুস্থলি বা **পরাগথলি** (microsporangia or pollen sac) থাকে। তবে অধিকাংশ আবৃতবীজী উদ্ভিদে চারটি পরাগথলি দেখতে পাওয়া যায়।

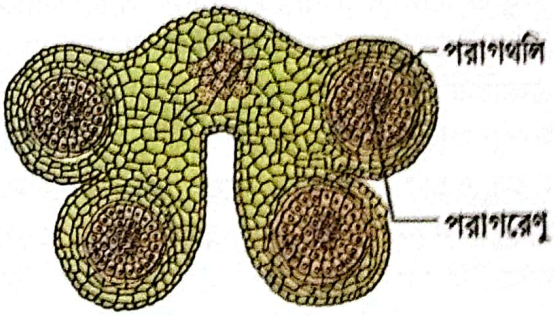

চিত্র-১০.১: পরাগধানীর ব্যবচ্ছেদ

প্রতিটা পরাগথলির ৫-৭টি কোষ পুরু একটি বন্ধ্যা আবরণ থাকে। আবরণের সবচেয়ে ভেতরের স্তরের নাম **ট্যাপেটাম** (tapetum)। এ স্তরের কোষগুলো অরীয়ভাবে লম্বা এবং বৃত্তাকারে সজ্জিত। ট্যাপেটামের মাঝে অপেক্ষাকৃত বড়, সুস্পষ্ট **স্পোরোজেনাস (sporogenous)** টিস্যু থাকে। যা একপর্যায়ে গোলাকার মাইক্রোস্পোর মাতৃকোষ গঠন করে। প্রতিটি মাইক্রোস্পোর মাতৃকোষ মায়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারটি করে মাইক্রোস্পোর (microspore) গঠন করে। প্রতিটি মাইক্রোস্পোর ক্রমশ রূপান্তরের মাধ্যমে পরাগরেণুতে (pollen grain) পরিণত হয়। এসময় ট্যাপেটাম স্তর গলে গিয়ে পুষ্টি সরবরাহ করে। পরাগরেণুগুলো পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় অথবা কিছু সময় একাধিক পরাগরেণু একত্রে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত থাকে। চারটি পরাগরেণু একত্রে থাকলে তাদের **পরাগরেণু চতুষ্টয়** (pollen tetrad) বলে। আবার Orchidaceae এবং Asclepiadaceae গোত্রের উদ্ভিদে পরাগরেণুগুলো একত্রে একটি থলিতে অবস্থান করে যা **পলিনিয়াম** (pollinium) নামে পরিচিত।

পরাগরেণুর গঠন: আকৃতিগতভাবে পরাগরেণু বিভিন্ন প্রকার হয়। যেমন- গোলাকার, ডিম্বাকার, ত্রিভুজাকার প্রভৃতি। প্রতিটি পরাগরেণু এককোষী, এক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট, দু'স্তর যুক্ত প্রাচীর দ্বারা আবৃত এবং হ্যাপ্লয়েড। এর বাইরের প্রাচীর পুরু, শক্ত, কিউটিনযুক্ত এবং নানাভাবে অলংকৃত, একে **এক্সাইন** (exine) বলে। এক্সাইনে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক উপাদান থাকে, তবে প্রধান উপাদানটি হলো স্পোরোপোলেনিন। আর ভেতরের প্রাচীর পাতলা যাকে ইনটাইন (intine) বলে। এটি মূলত সেলুলোজ নির্মিত। এক্সাইনের স্থানে স্থানে পাতলা স্থান থাকে যাকে জার্মপোর (germpore) বলে।

২. **পুংগ্যামিটোফাইটের বিকাশ (Development of Male Gametophyte):** পরাগরেণু পুং গ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ। পরাগধানী থেকে পরাগরেণু মুক্ত হবার পূর্বেই তার অঙ্কুরোদগম (কোষ বিভাজন) শুরু হয়। প্রথমেই নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে দু'টি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। বড়টিকে **নালিকা নিউক্লিয়াস** (tube nucleus) এবং ছোটটিকে **জনন নিউক্লিয়াস** (generative nucleus) বলে। সাধারণত এমন 'দ্বি-নিউক্লিয়াসযুক্ত' অবস্থায় পরাগমুক্তি ঘটে এবং পরাগরেণুর পরবর্তী বিকাশ গর্ভমুণ্ডে হয়। গর্ভমুণ্ড নিঃসৃত রসে পরাগরেণু উজ্জীবিত হয় এবং পরাগরেণুর ইনটাইন জার্মপোর এর মধ্যদিয়ে নালি আকারে বেরিয়ে আসে, একে **পরাগনালি** (pollen tube) বলে। পরাগরেণু হতে সম্পূর্ণ সাইটোপ্লাজমীয় বস্তু পরাগনালিতে স্থানান্তরিত হয়। পরাগনালির অগ্রভাগে নালিকা নিউক্লিয়াস আর তার পিছনে জনন নিউক্লিয়াস অবস্থান করে। পরাগনালির অগ্রভাগে **পেকটিনেজ** এনজাইম নিঃসরণের মাধ্যমে গর্ভমুণ্ড ও গর্ভদণ্ড ভেদ করে ক্রমশ গর্ভাশয়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ সময় জনন নিউক্লিয়াস বিভক্ত হয়ে দু'টি শুক্রাণু তথা পুং গ্যামিট গঠন করে। **পরাগরেণু, পরাগনালি এবং দু'টি পুং গ্যামিটকে মিলিতভাবে পুং গ্যামিটোফাইট** বলে।

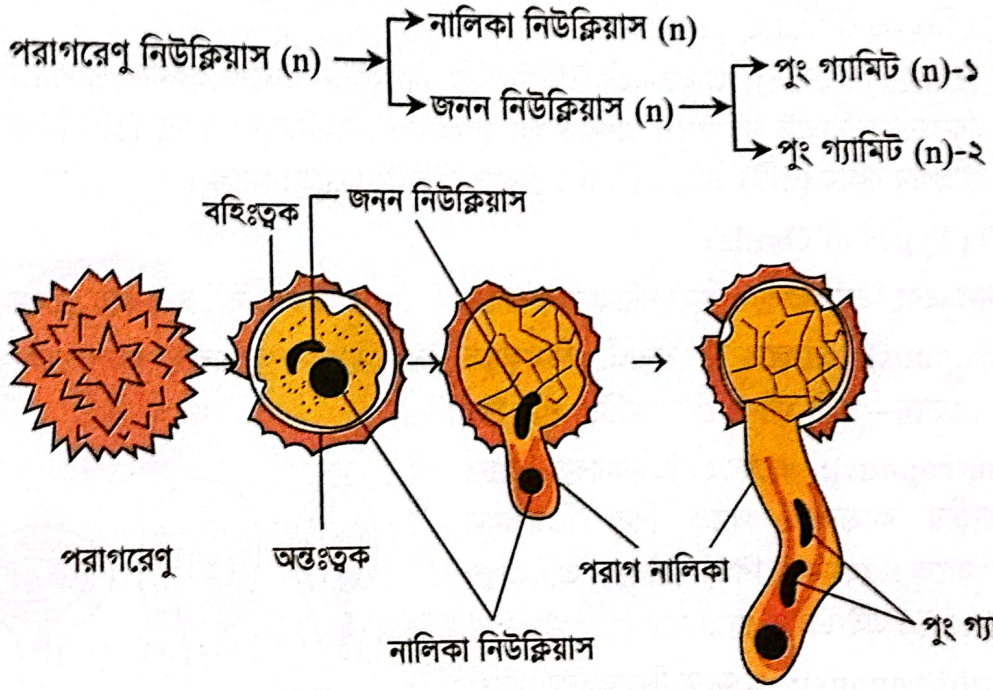

চিত্র-১০.২: পুং গ্যামিটোফাইটের বিকাশ

৩. **পরাগায়ন (Pollination):** পরাগধানী থেকে মুক্ত পরাগরেণু যেকোনো ভাবে একই ফুলের বা একই প্রজাতির উদ্ভিদের ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে। এ স্থানান্তরের জন্য বাতাস, পানি, পতঙ্গ, পাখি প্রভৃতি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সব পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে অঙ্কুরিত হয় না। কারণ ভিন্ন প্রজাতির হলে পরাগরেণু সেখানে নষ্ট হয়ে যায়। পরাগায়ন সকল নগ্নবীজী এবং আবৃতবীজী উদ্ভিদে ঘটে থাকে।

৪. **ডিম্বকের বিকাশ (Development of Ovule):** স্ত্রীরেণুস্থলীর অপর নাম ডিম্বক (ovule)। প্রতিটি গর্ভাশয়ের এক বা একাধিক স্থানে **অমরা** (placenta) নামক উর্বর টিস্যু থেকে ডিম্বক সৃষ্টি হয়। অমরার কিছু অংশ স্ফীত হয়ে ওঠে, যা দ্রুত মাঝের ছোট কোষীয় পিণ্ডকে ঘিরে দুটি পর্দায় আবৃত হয়। মাঝের কোষীয় পিণ্ডকে **নিউসেলাস** (nucellus) এবং পর্দা দুটিকে **ডিম্বকত্বক** (integument) বলে। নিউসেলাসের শীর্ষভাগ ডিম্বকত্বক দ্বারা আবৃত থাকে না, এ অংশকে **ডিম্বকরন্ধ্র** (micropile) বলে। ডিম্বকরন্ধ্রের কাছে নিউসেলাস টিস্যুর একটি কোষ

অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যাকে আর্কিস্পোরিয়াম (archesporium) বলে। এই কোষটি সরাসরি বা একবার বিভাজিত হয়ে ভিতরে মেগাস্পোর মাতৃকোষ (megaspore mother cell) গঠন করে। যা মায়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারটি মেগাস্পোর সৃষ্টি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চারটি মেগাস্পোর একটি সারিতে সাজানো থাকে। বাইরের ৩টি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ভেতরেরটি সক্রিয় থাকে।

ডিম্বকের গঠন: প্রতিটি ডিম্বক কতকগুলো অংশ নিয়ে গঠিত। যেমন–

i. **ডিম্বকনাড়ী (Funiculus):** ডিম্বকের যে অংশ বৃন্তের মতো এবং অমরার সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে ডিম্বকনাড়ী বলে।

ii. **ডিম্বকনাভী (Hilum):** ডিম্বকের যে স্থানে ডিম্বকনাড়ী সংযুক্ত থাকে তাকে ডিম্বকনাভী বলে।

iii. **ডিম্বকমূল (Chalaza):** ডিম্বকের যে অংশ থেকে ডিম্বকত্বক সৃষ্টি হয় তাকে ডিম্বকমূল বলে।

iv. **ডিম্বকত্বক (Integument):** নিউসেলাসের বাইরে সাধারণত দু'স্তরযুক্ত আবরণকে ডিম্বকত্বক বলে।

v. **ডিম্বকরন্ধ্র (Micropile):** ডিম্বকের অগ্রভাগে ডিম্বকত্বকের ছিদ্র অংশকে ডিম্বকরন্ধ্র বলে।

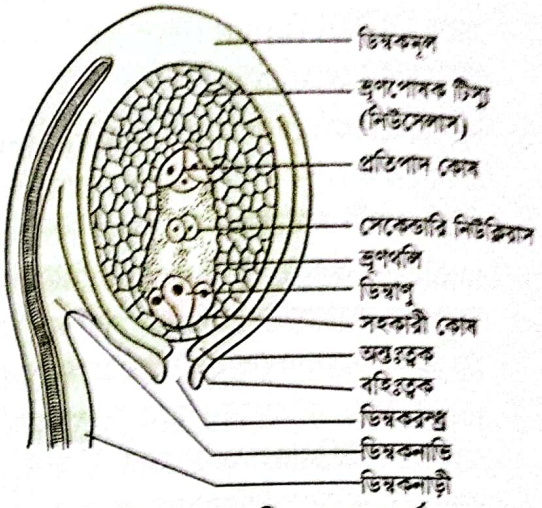

চিত্র-১০.৩: ডিম্বকের অন্তর্গঠন

vi. **নিউসেলাস (Nucellus):** পরিণত ডিম্বকের কেন্দ্রীয় ও প্রধান টিস্যুকে নিউসেলাস বলে, যা ভ্রূণথলি ধারণ করে এবং ডিম্বকত্বক দ্বারা আবৃত থাকে।

vii. **ভ্রূণথলি (Embryo Sac):** আবৃতবীজী উদ্ভিদের স্ত্রী গ্যামিটোফাইটকে ভ্রূণথলি বলে। নিউসেলাসের মধ্যে এবং ডিম্বকরন্ধ্রের নিকটে থলিসদৃশ অংশটি হল ভ্রূণথলি। ভ্রূণথলিতে গর্ভযন্ত্র (১টি ডিম্বাণু ও ২টি সহকারী কোষ), প্রতিপাদ কোষ (৩টি) এবং গৌণ নিউক্লিয়াস (১টি ডিপ্লয়েড) থাকে।

ডিম্বকের প্রকারভেদ (Types of Ovule)

ডিম্বকনাড়ী, ডিম্বকমূল এবং ডিম্বকরন্ধ্রের পারস্পরিক অবস্থানের ভিত্তিতে ডিম্বক বিভিন্ন প্রকার। যেমন–

i. **ঊর্ধ্বমুখী (Atropous):** এক্ষেত্রে ডিম্বকনাড়ী, ডিম্বকমূল এবং ডিম্বকরন্ধ্র একই সরল রেখায় এবং খাড়াভাবে অবস্থান করে। যেমন– পানি মরিচ, গোল মরিচ, পান ইত্যাদি।

ii. **নিম্নমুখী (Anatropous):** এক্ষেত্রে ডিম্বকরন্ধ্র নিচের দিকে ডিম্বকনাড়ীর কাছাকাছি থাকে কিন্তু ডিম্বকমূল উপরের দিকে থাকে। যেমন– শিম, ছোলা। অধিকাংশ আবৃতবীজীতে (৭৫%) এই টাইপ দেখা যায়।

iii. **পার্শ্বমুখী (Amphitropous):** এক্ষেত্রে ডিম্বকরন্ধ্র এবং ডিম্বকমূল একই রেখায় এবং ডিম্বকনাড়ীর সাথে সমকোণে অবস্থান করে। যেমন– ক্ষুদিপানা, পপি।

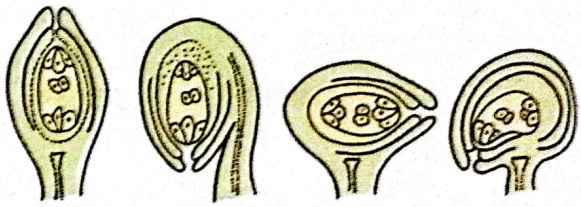

চিত্র-১০.৪: বিভিন্ন প্রকার ডিম্বকের গঠন

iv. **বক্রমুখী (Campylotropous):** এখানে ডিম্বকনাড়ী এবং ডিম্বকমূল সমকোণে অবস্থান করলেও ডিম্বকরন্ধ্র যথেষ্ট বেঁকে ডিম্বকনাড়ীর কাছাকাছি থাকে। যেমন– সরিষা, কালকাসুন্দা।

৫. **স্ত্রী গ্যামিটোফাইটের বিকাশ (Development of Female Gametophyte):** মেগাস্পোর বা স্ত্রীরেণু হলো স্ত্রী গ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ। এ কোষটি ক্রমশ আকারে বৃদ্ধি পেয়ে কয়েকটি নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী গ্যামিটোফাইট তথা ভ্রূণথলি গঠন করে। ভ্রূণথলির গঠন প্রধানত তিন প্রকার; যথা– (i) **মনোস্পোরিক (monosporic)**-এক্ষেত্রে একটি স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে, (ii) বাইস্পোরিক **(bisporic)**-এক্ষেত্রে দুটি স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে। এবং (iii) **টেট্রাস্পোরিক (tetrasporic)**-এক্ষেত্রে চারটি স্ত্রীরেণু

ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে। শতকরা প্রায় ৭৫টি উদ্ভিদেই মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় ভ্রূণথলি গঠিত হয়। ভ্রূণথলি গঠন আবৃতবীজীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যদিও আবৃতবীজী উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রকার ভ্রূণথলি দেখা যায় তবুও ৮০% প্রজাতিতে একই ধরনের, যা "পলিগোনাম টাইপ" নামে পরিচিত। নিচে এর বিকাশ বর্ণনা করা হলো—

মেগাস্পোর মাতৃকোষ (স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ) থেকে সৃষ্ট চারটি মেগাস্পোরের (স্ত্রীরেণু কোষ) মধ্যে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) বাইরের তিনটি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং শুধু ভেতরেরটি কার্যকরি থাকে, যা ক্রমশ একটি ভ্রূণথলি গঠন করে। এমন একক নিউক্লিয়াস থেকে সৃষ্ট ভ্রূণথলিকে **মনোস্পোরিক** (monosporic) বলে। সক্রিয় মেগাস্পোর কোষটি প্রথমে আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে দুটি নিউক্লিয়াস গঠন করে। এরা কোষের দু'প্রান্তে চলে যায় এবং পরপর দু'বার মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারটি করে নিউক্লিয়াস গঠন করে। প্রতি প্রান্ত থেকে একটি করে নিউক্লিয়াস কেন্দ্রে সরে আসে এবং তারা মিলিত হয়ে **গৌণ নিউক্লিয়াস** (2n) গঠন করে। ডিম্বকরন্ধ্রের প্রান্তে অবশিষ্ট তিনটি নিউক্লিয়াস কোষ গঠন করে ও **গর্ভযন্ত্রে** পরিণত হয়। এদের একটি অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে **ডিম্বাণু** (egg) গঠন করে আর বাকি দু'টিকে **সহকারি কোষ** (synergids) বলে। নিচের তিনটি নিউক্লিয়াস সামান্য সাইটোপ্লাজমসহ কোষে পরিণত হয় এবং তাদের একত্রে **প্রতিপাদ কোষ** (antipodal cells) বলে। আবৃতবীজী উদ্ভিদে গর্ভযন্ত্র, গৌণ নিউক্লিয়াস এবং প্রতিপাদ কোষগুলো মিলিতভাবে থলিসদৃশ যে দেহ গঠন করে তাকে স্ত্রী গ্যামিটোফাইট বলে। ডিম্বকের মধ্যে স্ত্রী গ্যামিটোফাইটের উৎপত্তি ঘটে। স্ত্রী গ্যামিটোফাইট স্পোরোফাইট এর উপর নির্ভরশীল।

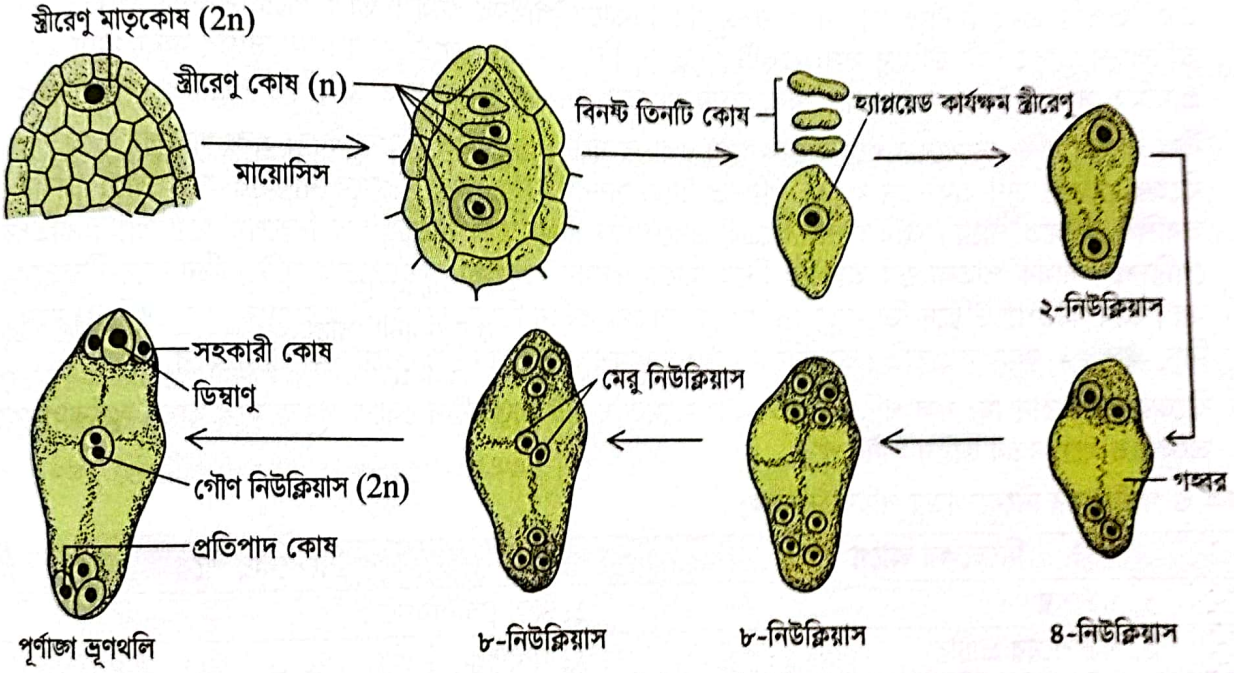

চিত্র-১০.৫: স্ত্রী গ্যামিটোফাইটের বিকাশ

৬. **নিষেক (Fertilization):** আবৃতবীজীর যৌন জনন পদ্ধতি **উগ্যামাস** (oogamous) টাইপের। গর্ভযন্ত্রে অবস্থিত নিশ্চল ডিম্বাণুর সাথে সচল শুক্রাণুর মিলনকে নিষেক বলে। এ সময় গর্ভাশয় ও ডিম্বক নিঃসৃত পদার্থে Ca^{++} আয়ন উপস্থিত থাকে। আবৃতবীজীর নিষেক প্রক্রিয়াটি কয়েকটা ধাপে সম্পন্ন হয়। যথা-

i. **ভ্রূণথলিতে পরাগনালির অনুপ্রবেশ:** গর্ভদণ্ডের মধ্য দিয়ে পরাগনালি গর্ভাশয়ের প্রাচীর ভেদ করে ডিম্বকরন্ধ্রের কাছে পৌঁছায়। আম, জামসহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাগনালি ডিম্বকরন্ধ্র দিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে (porogamy)। ঝাউসহ কিছু কিছু উদ্ভিদে পরাগনালি ডিম্বকমূল দিয়ে (chalazogamy); লাউ, কুমড়ায় ডিম্বকত্বক ভেদ করে (mesogamy) পরাগনালি ডিম্বকে প্রবেশ করে। শেষ পর্যন্ত পরাগনালি ভ্রূণথলিতে অনুপ্রবেশ করে এবং সহকারী কোষের উপর দিয়ে ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছায়। এক সময় পরাগনালির অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে ফেটে যায় এবং শুক্রাণু দুটি ভ্রূণথলিতে নিক্ষিপ্ত হয়।

ii. **ডিম্বাণু অভিমুখে শুক্রাণুর চলন:** শুক্রাণু দু'টির একটি ডিম্বাণু অভিমুখে এবং অপরটি গৌণ নিউক্লিয়াস অভিমুখে অ্যামিবার মতো সরে যেতে থাকে।

iii. **ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলন:** দু'টি শুক্রাণুর একটি সহজেই ডিম্বাণুতে পৌঁছায় এবং ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়। শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলনকে প্রকৃত নিষেক বা সিনগ্যামি (syngamy) বলে। নিষেকের ফলে ডিপ্লয়েড জাইগোট (2n) উৎপন্ন হয়।

iv. **ত্রিমিলন:** দ্বিতীয় শুক্রাণুটি গৌণ নিউক্লিয়াসের সংস্পর্শে আসে এবং তার সাথে মিলিত হয়ে প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস (3n) গঠন করে এবং এ থেকে উৎপন্ন সস্য কোষ ট্রিপ্লয়েড (3n) প্রকৃতির হয়। শুক্রাণুর (n) সাথে গৌণ নিউক্লিয়াসের (2n) মিলনকে প্রকৃত অর্থে **ত্রিমিলন** (triple fusion) বলে। কারণ, এখানে দুটি মেরু নিউক্লিয়াস এবং শুক্রাণুর মিলন ঘটে। **ডিম্বাণু ও গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে শুক্রাণু দু'টির মিলনকে একত্রে দ্বিনিষেক (double fertilization) বলে।** প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস হতে বিভাজন ও কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে **সস্য টিস্যু** (endosperm) উৎপন্ন হয়। **দ্বিনিষেক আবৃতবীজী বা গুপ্তবীজী উদ্ভিদের অনন্য বৈশিষ্ট্য।**

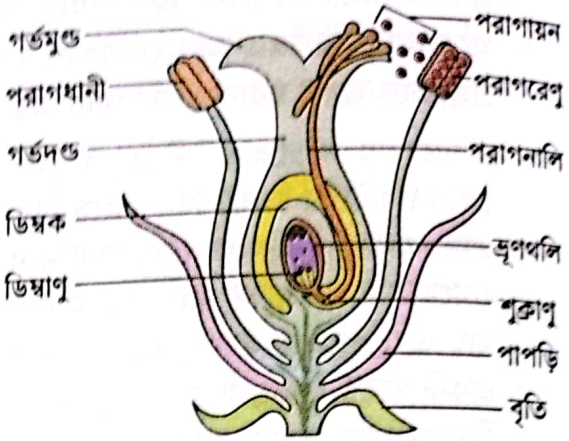

চিত্র-১০.৬: নিষেক প্রক্রিয়া

৭. **ভ্রূণের বিকাশ:** নিষেকোত্তর ডিম্বকের মধ্যে ভ্রূণ এবং সস্য একই সাথে বিকাশ লাভ করে। জাইগোট প্রাচীরে আবদ্ধ হয়ে উস্পোর গঠন করে এবং নির্দিষ্ট সময় সুপ্তাবস্থায় থেকে বিভাজিত হওয়া শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ভ্রূণের বিকাশে পার্থক্য নেই। তবে পরে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। অধিকাংশ আবৃতবীজী উদ্ভিদে সস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টিস্যু, কারণ এতে বিকাশমান ভ্রূণের জন্য খাদ্য মজুদ থাকে। প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস বার বার বিভাজনের মাধ্যমে ভ্রূণথলিতে ভ্রূণ ছাড়া অবশিষ্ট স্থান পূর্ণ করে থাকে।

৮. **বীজ ও ফল সৃষ্টি:** নিষেকের পরে অনেকগুলো রূপান্তর ঘটে। যার ফলে ডিম্বক বীজে এবং গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়। বীজের ভেতরে ভ্রূণ অবস্থান করে। পরিণত বীজে সম্পূর্ণ সস্য খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হতে পারে আবার আংশিক অবশিষ্ট থাকতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রূণপোষক টিস্যু তথা নিউসেলাস নিঃশেষ হয়ে যায়। কতিপয় ক্ষেত্রে **পেরিস্পার্ম** নামক পাতলা স্তর আকারে টিকে থাকে, যেমন- শাপলা। ডিম্বকত্বক দুটি কঠিন হয়ে বীজত্বকে পরিণত হয়। তবে কতিপয় উদ্ভিদে ডিম্বকত্বকের বাইরে রসালো তৃতীয় ডিম্বকত্বক সৃষ্টি হয় যাকে **এরিল** (aril) বলে। যেমন- লিচু, আঁশফল, জয়ফল প্রভৃতি। অন্যদিকে গর্ভাশয় ক্রমশ আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে ফল গঠন করে।

৯. **বীজের অঙ্কুরোদগম:** ফল পরিপক্ব হলে বীজ সমেত ফলটি মাতৃউদ্ভিদ থেকে পৃথক হয়ে যায়। সুপ্তকাল শেষে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।

ডিম্বক ও গর্ভাশয়ের নিষেকোত্তর পরিবর্তনসমূহ:

নিষেকের আগে	নিষেকের পরে
১. গর্ভাশয়	১. ফল (সাধারণত)
২. গর্ভাশয়ের প্রাচীর	২. ফলত্বক
৩. ডিম্বক	৩. বীজ
৪. ডিম্বকনাড়ী	৪. বীজবৃন্ত
৫. ডিম্বকনাভী	৫. বীজনাভী
৬. ডিম্বকমূল	৬. নষ্ট হয়ে যায় (বীজমূল)
৭. ডিম্বকরন্ধ্র	৭. বীজরন্ধ্র
৮. ডিম্বক বহিঃত্বক	৮. বীজ বহিঃত্বক (টেস্টা)
৯. ডিম্বক অন্তঃত্বক	৯. বীজ অন্তঃত্বক (টেগমেন)
১০. নিউসেলাস	১০. সাধারণত নিঃশেষ হয়ে যায় অথবা পেরিস্পার্ম
১১. ডিম্বাণু	১১. ভ্রূণ
১২. সহকারি কোষ	১২. নষ্ট হয়ে যায়
১৩. প্রতিপাদ কোষ	১৩. নষ্ট হয়ে যায়
১৪. সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস	১৪. সস্য

নিষেকের গুরুত্ব বা তাৎপর্য (Importance/ Significance of Fertilization)

১. **ক্রোমোসোমের ভারসাম্য রক্ষায়:** ক্রোমোসোমের ভারসাম্য রক্ষায় নিষেক ক্রিয়ার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নিষেক ক্রিয়ার ফলে পুংগ্যামিট ও স্ত্রী গ্যামিটের মিলনে জাইগোট উৎপন্ন হয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুং ও স্ত্রী গ্যামিটের দুই প্রস্থ হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমোসোম মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থা ফিরে আসে। ফলে জাইগোট থেকে সৃষ্ট বংশধরে প্রজাতির ক্রোমোসোম সংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা পায়।

২. **নতুন প্রজাতি সৃষ্টি:** নিষেকের মাধ্যমে বংশধরের মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার ঘটে। ফলে নিষেকের মাধ্যমেই নতুন প্রজাতি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি।

৩. **খাদ্যের যোগান:** প্রকৃতিতে যত রকমের খাবার রয়েছে তার অধিকাংশই ফল বা বীজ থেকে পাওয়া যায়। নিষেক না ঘটলে ফল ও বীজ তৈরি হতো না। ফল ও বীজ তৈরি না হলে খাবার পাওয়া যেতো না। সুতরাং নিষেক ক্রিয়া পরোক্ষভাবে জীবের খাদ্যের যোগান দিয়ে থাকে।

৪. **বিবর্তনে:** নিষেকের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রকরণ বিবর্তনের ধারা নির্দেশ করে।

৫. **ফল ও বীজ সৃষ্টি:** নিষেকের পর গর্ভাশয় ফলে এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয়। অর্থাৎ ফল ও বীজ তৈরিতে নিষেকের ভূমিকা রয়েছে।

৬. **জিন বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে:** নিষেক ক্রিয়ার ফলে গ্যামিটের মিলনের সময় জিনের মিশ্রণ ঘটে। ফলে সৃষ্ট জীবে জিন বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

৭. **অধিক ফলনশীল ও বিরূপতা সহনশীল ফসল সৃষ্টি:** নিষেকের ফলে অধিক ফলনশীল ও বিরূপতা সহনশীল ফসল উৎপন্ন হয়।

৮. **উদ্ভিদের বংশরক্ষা:** উন্নত উদ্ভিদ সাধারণত বীজের মাধ্যমেই তাদের বংশধর সৃষ্টি এবং বংশরক্ষা করে। আবার, নিষেক ক্রিয়ার ফলেই সৃষ্টি হয় বীজ। অর্থাৎ উদ্ভিদের বংশরক্ষায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে নিষেক ক্রিয়ার।

যৌন প্রজননের সুফল (The Benefits of Sexual Reproduction)

১. যৌন প্রজননের ফলে রিকম্বিনেশনের মাধ্যমে জেনেটিক ডাইভার্সিটি তৈরি হয়।
২. জেনেটিক ডাইভার্সিটির কারণে উদ্ভিদের নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সুবিধা হয়।
৩. নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হতে পারে।
৪. খাদ্যশস্য, তৈলবীজ ইত্যাদি পরোক্ষভাবে আমরা যৌন জননের মাধ্যমে পেয়ে থাকি।

১০.১.২ প্রজননের গুরুত্ব (Importance of Reproduction)

- প্রজননের মাধ্যমে প্রজাতির ধারাবাহিকতা ও অস্তিত্ব সংরক্ষিত হয়।
- প্রজননের দ্বারা জীবের বংশবিস্তার ও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে।
- প্রজননের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষিত হয়।
- যৌন জননে বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটে, যা জীবের বিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- প্রজননের ফলে জীববৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়।

১০.১.৩ আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্রে জনুক্রম [প্রাসঙ্গিক আলোচনা]

(Alternation of generation in life cycle of angiosperm)

কোনো জীবের জীবনচক্র সম্পন্ন করার সময় গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়ের সাথে স্পোরোফাইটিক পর্যায়ের যে পালাক্রম ঘটে তাকে বলা হয় জনুক্রম। আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্র পর্যবেক্ষণ করলে সেখানে সুস্পষ্ট দুটি পর্যায় অর্থাৎ গ্যামিটোফাইটিক ও স্পোরোফাইটিক পর্যায় দুটির আবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্রে সুস্পষ্ট জনুক্রম রয়েছে। এদের জনুক্রমে গ্যামিটোফাইটিক (n) পর্যায়টি খুবই ছোট কিন্তু স্পোরোফাইটিক (2n) পর্যায়টি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ। এ কারণে আবৃতবীজী উদ্ভিদের জনুক্রমকে বলা হয় **অসমপ্রকৃতির জনুক্রম**। নিচে সংক্ষেপে এদের জনুক্রমটি উল্লেখ করা হলো—

গ্যামিটোফাইটিক পর্যায় (n): গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়ে পুং গ্যামিট (শুক্রাণু) (n) এবং স্ত্রী গ্যামিট (ডিম্বাণু) (n) তৈরি হয়। ভ্রূণথলি এবং এতে অবস্থিত ডিম্বাণু, সহকারি কোষ, গৌণ নিউক্লিয়াস ও প্রতিপাদ কোষ সমষ্টিকে একত্রে বলা হয় স্ত্রী গ্যামিটোফাইট। স্ত্রী গ্যামিটোফাইটে ডিম্বাণু তথা স্ত্রী গ্যামিট তৈরি হয়। অন্যদিকে, শুক্রাণু ও পরাগনালিকাসহ পরাগরেণুকে বলা হয় পুংগ্যামিটোফাইট। পুংগ্যামিটোফাইটে জনন নিউক্লিয়াস থেকে শুক্রাণু তথা পুংগ্যামিট তৈরি হয়।

স্পোরোফাইটিক পর্যায় (2n): ডিপ্লয়েড জাইগোট (2n) হলো স্পোরোফাইটিক পর্যায়ের প্রথম কোষ। নিষেক প্রক্রিয়ায় হ্যাপ্লয়েড (n) ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলিত হয়ে জাইগোট গঠন করে। ডিপ্লয়েড জাইগোট বারবার মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে বহুকোষী ভ্রূণে পরিণত হয় এবং ভ্রূণটি বীজের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। অনুকূল পরিবেশে বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং অবিরত মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে ভ্রূণ শিশু চারায় রূপ নেয়। চারা উদ্ভিদ ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ ডিপ্লয়েড উদ্ভিদের জন্ম দেয়। পরিণত অবস্থায় ডিপ্লয়েড উদ্ভিদে জননাঙ্গ তথা ফুল তৈরি হয় এবং সেখানে পুনরায় গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এভাবে আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্রে সুস্পষ্ট জনুক্রম দেখতে পাওয়া যায়।

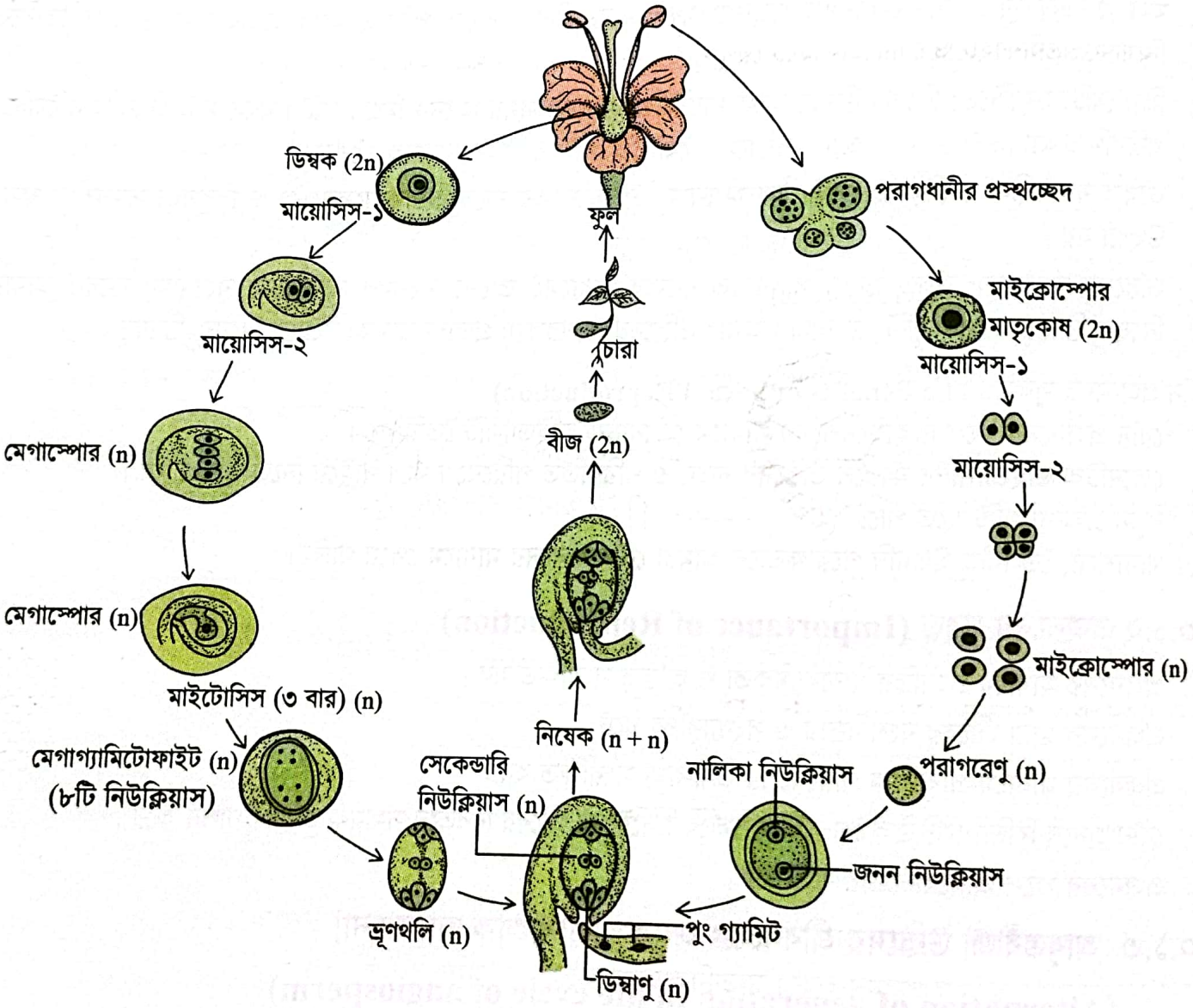

চিত্র-১০.৭: আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্রে জনুক্রম

শ্রেণির কাজ

একটি পরাগরেণুর পুংজনন কোষ সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করো এবং একটি প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ ২

অযৌন জনন
Asexual Reproduction

১০.২ অযৌন জনন (Asexual Reproduction)

দুটি গ্যামিটের মিলন ছাড়া জীবের বংশবিস্তারের সকল পদ্ধতিকে অযৌন জনন বলে। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। আবৃতবীজী উদ্ভিদে সাধারণত দেহ অঙ্গের মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। অযৌন জনন প্রধানত দু'প্রকার– (ক) স্পোরের সাহায্যে অযৌন জনন ও (খ) অঙ্গজ প্রজনন।

১০.২. ১ স্পোরের সাহায্যে অযৌন প্রজনন (Asexual Reproduction by Spores)

নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ সাধারণত বিশেষ ধরনের রেণু বা স্পোরের উৎপাদনের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। বিশেষ আকৃতির থলিতে রেণু উৎপন্ন হয়। এ থলিকে রেণুস্থলি বা স্পোরাঙ্গিয়াম (sporangium) বলে। রেণু সাধারণত এককোষী তবে বহুকোষী হতে পারে। সচল অথবা নিশ্চল প্রকৃতির হয়। অনুকূল পরিবেশে রেণু সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন বংশধর উৎপন্ন করে। শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইট ও টেরিডোফাইটে রেণু সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাপক হারে অযৌন জনন ঘটে।

ছত্রাক ও শৈবালে বিভিন্ন ধরনের স্পোর তৈরি হতে দেখা যায়। যেমন— ছত্রাকের ক্ষেত্রে মিউকরে স্পোরাঙ্গিওস্পোর, পেনিসিলিয়ামে কনিডিওস্পোর, অ্যাগারিকাসে বেসিডিওস্পোর। অন্যদিকে শৈবালে জুস্পোর, অ্যাকাইনেট, অ্যাপ্লানোস্পোর ইত্যাদি স্পোর তৈরি হয়ে থাকে। ফার্ন ও লাইকোপোডিয়ামের স্পোর সম-আকৃতির অর্থাৎ হোমোস্পোরাস (homosporous)। অন্যদিকে, সেলাজিনেলা, শুষনি শাক ইত্যাদির স্পোর অসম-আকৃতির অর্থাৎ হেটারোস্পোরাস প্রকৃতির (heterosporous)।

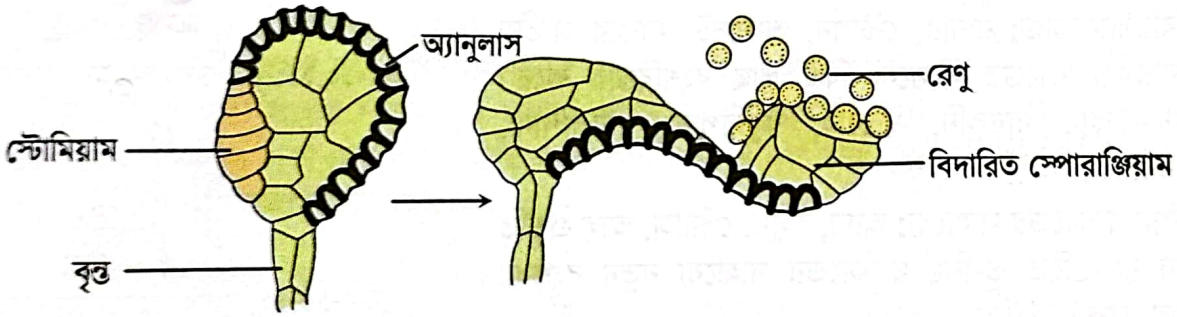

চিত্র-১০.৮: রেণুর সাহায্যে প্রজনন (ফার্নের স্পোরাঙ্গিয়া)

১০.২.২ অঙ্গজ প্রজনন (Vegetative Reproduction)

দেহের অঙ্গজ কোন অংশ যখন সরাসরি বংশধর উৎপন্ন করে তখন তাকে অঙ্গজ প্রজনন বলে। অঙ্গজ প্রজননের ফলে উৎপন্ন বংশধরে মাতৃ উদ্ভিদের গুণাবলি অপরিবর্তিত থাকে। এরূপ বংশধরকে ক্লোন (Clone) বলা হয়। অঙ্গজ প্রজনন স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উভয় প্রকার হতে দেখা যায়।

স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন (Natural Vegetative Reproduction): প্রকৃতিগতভাবে উদ্ভিদে যে অঙ্গজ প্রজনন ঘটে তাকে স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন বলে। স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন বিভিন্ন প্রকার। যথা—

১. **খণ্ডায়ন (Fragmentation):** যান্ত্রিক আঘাতে বা পুরাতন অংশের পচনের ফলে দেহ খণ্ডিত হলে প্রতিটি খণ্ড হতে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে খণ্ডায়ন বলে। শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইটা প্রভৃতিতে এরূপ বংশবিস্তার লক্ষ করা যায়।

২. **বাডিং (Budding):** ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট প্রভৃতি এককোষী উদ্ভিদে বাডিং ঘটতে দেখা যায়। এ সময় কোষের এক পাশে স্ফীতি দেখা যায় যাকে মুকুল বা বাড (bud) বলে। মুকুল ক্রমশ আকারে বড় হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে মাতৃদেহ হতে পৃথক হয়ে নতুন বংশধরে পরিণত হয়।

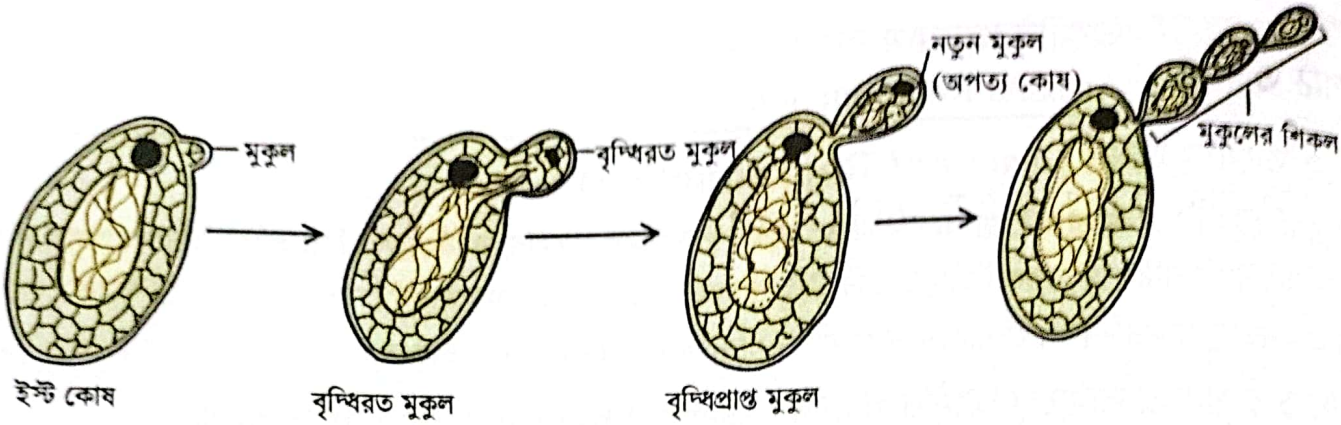

চিত্র-১০.৯: ইস্ট এর বাডিং প্রক্রিয়া

৩. **দ্বি-বিভাজন (Binary Fission):** ব্যাকটেরিয়া ও এককোষী কিছু শৈবাল ও ছত্রাক দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে। এ সময়ে এদের কোষমধ্য অঞ্চলে কোষঝিল্লি ও কোষপ্রাচীরে সংকোচন শুরু হয় এবং সংকোচন ক্রমশ গভীরতর হওয়ায় মাতৃকোষ দুটি অপত্য কোষে বিভক্ত হয়। কোষ দুটি পরস্পর পৃথক হয়ে নতুন বংশধর উৎপন্ন করে।

৪. **কাণ্ডের মাধ্যমে:** কাণ্ড অনেক সময় স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজননে অংশগ্রহণ করে। নিচে কাণ্ডের মাধ্যমে অঙ্গজ প্রজননের কতিপয় পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

স্বাভাবিক কাণ্ড: পান, আখ প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ডের পর্বে সৃষ্ট বাড থেকে নতুন উদ্ভিদ তৈরি হয় বলে এদের কাণ্ড খণ্ডিত করে রোপন করা হয়।

অর্ধবায়বীয় কাণ্ড: রানার, স্টোলন, অফসেট, সাকার জাতীয় অর্ধবায়বীয় কাণ্ডের সাহায্যে কিছু গাছ বংশবিস্তার করে। যেমন- কচু, থানকুনি, স্ট্রবেরি, কচুরিপানা, টোপাপানা, চন্দ্রমল্লিকা।

ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের সাহায্যে: আদা, হলুদ, পেঁয়াজ, আলু প্রভৃতি উদ্ভিদ রূপান্তরিত ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের সাহায্যে নতুন বংশধর উৎপন্ন করে।

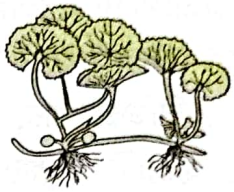

চিত্র-১০.১০: অর্ধবায়বীয় কাণ্ড (থানকুনি)

চিত্র-১০.১১: ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের সাহায্যে (আদা)

চিত্র-১০.১২: বুলবিলের সহায্যে (গাছ আলু)

৫. **সঞ্চয়ী মুকুলের সহায্যে:** কিছু উদ্ভিদের পাতার কক্ষে উৎপন্ন মুকুল খাদ্য সঞ্চয় করে রূপান্তরিত হয় যাকে বুলবিল বলে। এ বুলবিল বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন বংশধর উৎপন্ন হয়। যেমন— গাছ আলু।

৬. **মূলের সাহায্যে:** পটল, কাকরোল, ডালিয়া, মিষ্টি আলু, শতমূলী প্রভৃতি উদ্ভিদের ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত মূলের সাহায্যে বংশবিস্তার ঘটে।

চিত্র-১০.১৩: মূলের সাহায্যে (শতমূলী)

৭. **পাতার সাহায্যে:** পাথরকুঁচি পাতার পত্রফলকের কিনারায় অস্থানিক মুকুল উৎপন্ন হয়। এ পাতা মাটিতে পতিত হলে চারা গাছ জন্মে। এছাড়া নাইট কুইনেও পাতার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ঘটে।

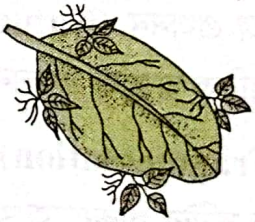

চিত্র-১০.১৪: পাতার সাহায্যে (পাথরকুঁচি)

একক কাজ

উদাহরণসহ উদ্ভিদের স্বাভাবিক অঙ্গজ জননের প্রকারভেদ ছকাকারে লিপিবদ্ধ করো।

পাঠ ৩

উদ্ভিদের কৃত্রিম অঙ্গজ জনন
Artificial Vegetative Propagation of Plants

১০.৩ উদ্ভিদের কৃত্রিম অঙ্গজ জনন (Artificial Vegetative Propagation of Plants)

প্রচলিত ধারায় বীজের মাধ্যমে সৃষ্ট বংশধরে সঠিক গুণাবলি সংরক্ষণ খুব জটিল। কারণ এ পদ্ধতিতে প্রতি প্রজন্মে কিছু পরিবর্তন ঘটে। অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে বংশানুক্রমে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকতে দেখা যায় যা উৎপাদকের জন্য একান্ত কাম্য। কৃত্রিমভাবে অঙ্গজ প্রজনন প্রক্রিয়ায় ক্লোন তৈরি করা হলে মাতৃ উদ্ভিদের জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অসংখ্য উদ্ভিদ অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে তৈরি করা সম্ভব। এছাড়া বাণিজ্যিক চাহিদা সম্পন্ন ফুল ও ফল উৎপাদনকারী অনেক উদ্ভিদ (যেমন- গোলাপ) বন্ধ্যা হতে দেখা যায়। এসব উদ্ভিদ অঙ্গজ বংশবিস্তারের মাধ্যমে বংশরক্ষা করে। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ অংশ ব্যবহার করে কলম তৈরির মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে বংশধর উৎপন্ন করে। এভাবে উৎপন্ন নতুন উদ্ভিদে মাতৃউদ্ভিদের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে ফুল, ফল, বীজ প্রভৃতি উন্নত মানের হয়। উদ্ভিদের কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন প্রধানত চার প্রকার। তবে উদ্ভিদ প্রজননবিদরা বর্ণনার সুবিধার জন্য আরো কিছু নামে কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজননকে বর্ণনা করে থাকেন। নিচে কয়েক প্রকার কৃত্রিম অঙ্গজ জনন পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো—

১. শাখা কলম (Cutting)

বসন্তের শুরুতে এ পদ্ধতিতে উদ্ভিদ কাণ্ডের ৪-৫ পর্ব বিশিষ্ট শাখা কেটে মাটিতে ৪৫° কোণ করে লাগিয়ে সেচ দিতে হয়। কয়েক দিনের মধ্যে মাটি সংলগ্ন অংশ হতে অস্থানিক মূল ও উপরের কাক্ষিক মুকুল হতে শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন হয়। মাটিতে পোঁতার আগে শাখার ঊর্ধ্ব প্রান্তে মোমের প্রলেপ দিতে হয়। কাণ্ডের নিচের অংশ হরমোন দ্রবণে ডুবিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি মূল গজায়। পাতাবাহার, জবা, গোলাপ, সজিনা গাছে নিয়মিত শাখা কলম করা হয়।

২. দাবা কলম (Layering)

এ পদ্ধতিতে গাছের মাটি সংলগ্ন কচি শাখা এমনভাবে মাটি চাপা দিতে হয়, যাতে শাখার অগ্রভাগ বাইরে থাকে। কয়েকদিন সেচ দিলে মাটি সংলগ্ন স্থানে মূল গজায়। এবার মূলসহ শাখাটি কেটে অন্যত্র রোপণ করলে নতুন গাছ পাওয়া যায়। শীতকাল ছাড়া প্রায় সারা বছরই এ পদ্ধতিতে কলম করা যায়। আঙ্গুর, আপেল, লেবু, পেয়ারা, ডালিম প্রভৃতি উদ্ভিদে দাবা কলম করা হয়।

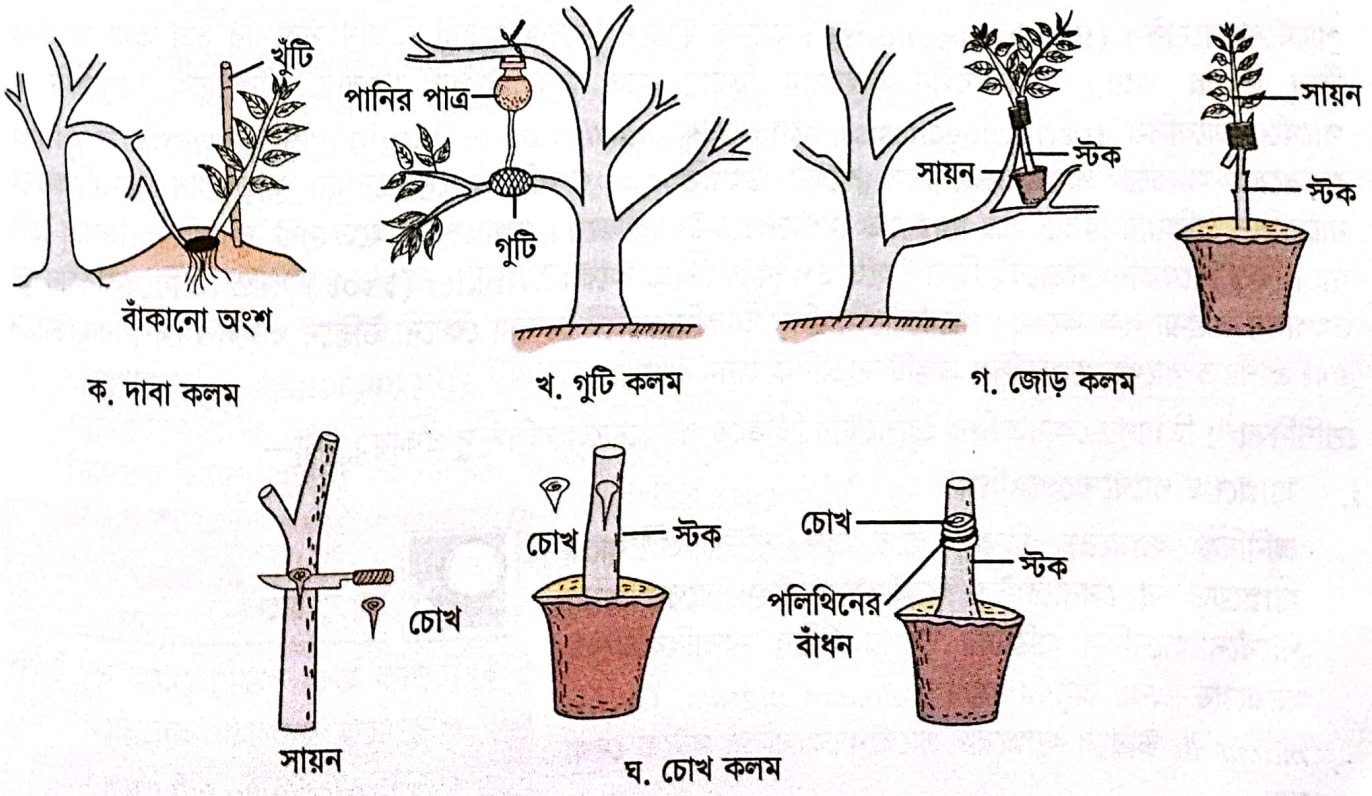

চিত্র-১০.১৫: কলম করার বিভিন্ন পদ্ধতি

৩. **গুটি কলম (Gootee)**

শক্ত শাখাযুক্ত ফুল বা ফল গাছের নির্বাচিত শাখার কয়েক ইঞ্চি বাকল চারদিক থেকে তুলে নেয়া হয়। এরপর সারযুক্ত মাটি ও খড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে কিছুদিন পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে কাটা অংশে মূল গজায়। মূল বড় হলে শাখাটি কেটে অন্যত্র রোপন করা হয়। বর্ষার শুরুতে লিচু, আম, জামরুল, পেয়ারা প্রভৃতি গাছে গুটি কলম করা হয়।

৪. **জোড় কলম (Grafting)**

ভালো জাতের গুণমান বজায় রাখার জন্য জোড় কলম ইদানিং খুব জনপ্রিয়। এ পদ্ধতিতে উন্নতমানের গাছের শাখার কিছু অংশ কৌণিকভাবে কেটে অন্য একটি গাছে সমব্যাসের শাখার সাথে জুড়ে দেয়া হয়। জোড়া দেয়া স্থানটি শক্ত করে পলিথিন দিয়ে বেঁধে বায়ুরোধী করে ঢেঁকে দেয়া হয়। কিছু দিনের মধ্যেই অংশ দুটি জোড়া লেগে যায়। উন্নত গুণসম্পন্ন যে গাছের অংশ জোড়া দেয়া হয় তাকে **সায়ন** (scion) ও যে গাছে জোড়া লাগান হয় তাকে **স্টক** (stock) বলে। জোড়া সম্পূর্ণ হলে স্টকের উপরিভাগের সম্পূর্ণ অংশ কেটে বাদ দিলে সায়ন থেকে কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ পাওয়া যায়। আম, বরই, কুল, জাম প্রভৃতি গাছে জোড় কলম করা হয়।

৫. **চোখ কলম (Budding)**

এ পদ্ধতিতে একটি গাছের কাণ্ডে অন্য গাছের কাক্ষিক মুকুল সংযুক্ত করা হয়। যে গাছের কাণ্ডে মুকুল সংযোজন করা হয় তার সুবিধামতো শাখায় চাকু দিয়ে 'T' আকারে বাকল তুলে নিয়ে সেই স্থানে কাঙ্ক্ষিত গাছের একটি মুকুল (অনুরূপ আকারে) নিয়ে বায়ুরোধী করে বেঁধে দেয়া হয়। কয়েকদিনের মধ্যে মুকুলটি মাতৃগাছের সাথে সংযুক্ত হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে নতুন শাখা উৎপন্ন করে। কুল, গোলাপ প্রভৃতি গাছে চোখ কলম বহুল প্রচলিত।

৬. **টিস্যু কালচার (Tissue Culture)**

ইদানিং বিজ্ঞানীগণ অতিদ্রুত অধিক সংখ্যক কাঙ্ক্ষিত মানের চারা উৎপাদনের কলাকৌশল আবিষ্কার করেছেন। যেমন– সস্যদানা, ফলজ, কাষ্ঠ উৎপাদনকারী, অর্কিড, ফুল প্রভৃতি। উদ্ভিদের যেকোনো অঙ্গের জীবন্ত কোষ ব্যবহার করে যে পদ্ধতিতে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে অসংখ্য সমগুণের ও সমবয়সী চারা তৈরি করা হয় তাকে টিস্যু কালচার বলে। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন উদ্ভিদের চারা তৈরি করা হয়। যেমন- জারবেরা, কলা, কাঁঠাল, অর্কিড, আলু প্রভৃতি। বর্তমানে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে নতুন বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের ফুল ও ফল গাছ তৈরি করা হচ্ছে।

১০.৪ অস্বাভাবিক জনন কৌশল (Unnatural Propagation)

১. **পার্থেনোজেনেসিস (Parthenogenesis) :** অনেক উদ্ভিদে নিষেক ছাড়াই ডিম্বাণু সরাসরি ভ্রূণ তথা স্বাভাবিক বীজ উৎপন্ন করে। নিষেকবিহীন অবস্থায় ডিম্বাণু হতে ভ্রূণ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে **অপুংজনি** বা **পার্থেনোজেনেসিস** (parthenogenesis) বলে। গ্রিক *parthenos* = virgin এবং *genesis* = origin শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে পার্থেনোজেনেসিস শব্দের উৎপত্তি। এ পদ্ধতিতে মেগাস্পোর মাতৃকোষ স্বাভাবিকভাবে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে হ্যাপ্লয়েড মেগাস্পোর উৎপন্ন করে। মেগাস্পোর হতে সৃষ্ট ভ্রূণথলিতে ডিম্বাণু তৈরি হয়। কিন্তু নিষেকবিহীনভাবেই ডিম্বাণু হতে ভ্রূণ বিকাশ লাভ করে। Winkler (১৯০৮) সর্বপ্রথম নিষেকবিহীন ভ্রূণ উৎপাদন প্রক্রিয়া লক্ষ করেন। পার্থেনোজেনেসিস আকস্মিকভাবে কোনো কোনো উদ্ভিদে ঘটলেও বেশ কিছু উদ্ভিদে এবং প্রাণীতে পার্থেনোজেনেসিস একটি স্বাভাবিক জনন প্রক্রিয়া।

শ্রেণিবিভাগ: ডিম্বাণুর কোষতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পার্থেনোজেনেসিস দু'প্রকার। যথা—

i. **হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস**

অনিষিক্ত হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু হতে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে হ্যাপ্লয়েড বা জেনারেটিভ পার্থেনোজেনেসিস বলে। এমন পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবেই হ্যাপ্লয়েড এবং অনুর্বর হয়। *Solanum nigrum, Orchis maculata* উদ্ভিদে হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস ঘটতে দেখা যায়।

জেনে রাখো

- নিষেক ছাড়া শুক্রাণু থেকে ভ্রূণ তৈরির প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যান্ড্রোজেনেসিস। যেমন: *Nicotiana tabacum*।

ii. **ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস**

নিষেকবিহীনভাবে ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু হতে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ডিপ্লয়েড বা সোমাটিক পার্থেনোজেনেসিস বলে। মেগাস্পোর মাতৃকোষ হতে মায়োসিস ব্যতীত মেগাস্পোর উৎপন্ন হলে ঐ মেগাস্পোর থেকে ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু উৎপন্ন হতে পারে। অথবা মেগাস্পোর মাতৃকোষ মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হলেও ভ্রূণস্থলি বিকাশের পর্যায়ে দুটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস মিলিত হওয়ার ফলে ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু তৈরি হয়। যেমন- *Taraxacum albidum*, *Parthenium argentatum*। অনেক সময় নিষেক ছাড়া শুক্রাণু থেকে ভ্রূণ তৈরি হতে দেখা যায়। যেমন- *Nicotiana tabacum* (তামাক)। নিষেক ছাড়া শুক্রাণু থেকে ভ্রূণ তৈরির এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যান্ড্রোজেনেসিস।

কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস: কৃত্রিমভাবে অনেক উদ্ভিদে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো সম্ভব হয়েছে। পুংগ্যামিট ডিম্বাণুতে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এরূপ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী পদার্থ প্রয়োগ করে নিষেকবিহীনভাবেই ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ তৈরি করা হয়। এক্স-রে প্রয়োগে, অন্য উদ্ভিদের পরাগ দিয়ে পরাগায়ন করে, ইমাস্কুলেশন, পর-পরাগায়ন বিলম্বিত করে বা বেলভিটান নামক রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে কৃত্রিমভাবে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এভাবে কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে বীজহীন ফল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে **পার্থেনোকার্পি** (parthenocarpy) বলে। যেমন– লেবু, কমলালেবু প্রভৃতি।

জীবে সাধারণত দু'ভাবে কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো হয়ে থাকে। যথা—

ক. **ভৌত পদ্ধতি:** নিম্নলিখিত উপায়গুলো অনুসরণের মাধ্যমে কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো যায়—

- অনিষিক্ত ডিম্বাণুকে বৈদ্যুতিক শকের মাধ্যমে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো যায়।
- অনেক সময় অনিষিক্ত ডিম্বাণুকে 30°C তাপমাত্রা থেকে 0°C – 10°C তাপমাত্রায় স্থানান্তরের মাধ্যমে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো যায়। অর্থাৎ অনিষিক্ত ডিম্বাণুতে তাপমাত্রার বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়ে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো যায়।
- সূক্ষ্ম সুঁচের সাহায্যে ডিম্বাণুকে খোচালে অনেক সময় পার্থেনোজেনেসিস ঘটে।
- অতিবেগুনি রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো যায়।

খ. **রাসায়নিক পদ্ধতি:** জীববিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে কিছু রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে অনিষিক্ত ডিম্বাণু পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় ভ্রূণ সৃষ্টি করে। পার্থেনোজেনেসিস সংঘটনকারী কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ হলো— পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ক্লোরোফর্ম, সোডিয়াম ক্লোরাইড, বিউটারিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, টলুইন, বেনজিন, অ্যাসিটোন ইত্যাদি।

পার্থেনোজেনেসিসের গুরুত্ব (Importance of Parthenogenesis)

১. পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় অনেক জীবে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। যেমন— বোলতা, মৌমাছি।
২. এ প্রক্রিয়া বংশগতীয় ক্রোমোসোম তত্ত্বকে সমর্থন করে।
৩. জীবে পলিপ্লয়েড অবস্থা সৃষ্টিতে পার্থেনোজেনেসিসের গুরুত্ব রয়েছে।
৪. পার্থেনোজেনেসিস জীবগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রকরণবিহীন করে।
৫. কিছু কিছু পতঙ্গের ক্ষেত্রে পার্থেনোজেনেসিস ঘটে বলে অতি দ্রুত এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। যেমন- অ্যাফিড।
৬. এ প্রক্রিয়া জীবের একটি অতি সরল, স্থায়ী ও সহজ প্রজনন প্রক্রিয়া।
৭. পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়া জীবের সুবিধাজনক মিউট্যান্ট বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিকাশে উৎসাহিত করে।
৮. জীব প্রজাতির বন্ধ্যাত্ব রক্ষায় পার্থেনোজেনেসিসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

২. **অ্যাপোস্পোরি (Apospory):** উদ্ভিদের যেকোনো ডিপ্লয়েড অঙ্গজ কোষ (2n) হতে যখন সরাসরি গ্যামিটোফাইটের উৎপত্তি ঘটে, তখন সেই অস্বাভাবিক অঙ্গজ জনন পদ্ধতিকে অ্যাপোস্পোরি বলে। এক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু ভ্রূণ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মক্ষম বীজ তৈরি করে। এখানে প্রাপ্ত উদ্ভিদ ডিপ্লয়েড এবং মাতৃ উদ্ভিদের সমগুণ সম্পন্ন হয়। যেমন- *Hieracium* সহ বিভিন্ন প্রকার ফার্নে এরূপ লক্ষ করা যায়।

৩. **অ্যাপোগ্যামি (Apogamy):** নিষেক ছাড়া ডিম্বাণু ব্যতীত ভ্রূণথলির অন্য যেকোনো কোষ থেকে ভ্রূণ (n) সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অ্যাপোগ্যামি বলে। যেমন- *Allium* সহ বিভিন্ন প্রকার ফার্নে এরূপ দেখা যায়।

দলীয় কাজ

দলগতভাবে কলম করার বিভিন্ন পদ্ধতি পোস্টার পেপারে অঙ্কন করে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দাও।

১০.৫ কৃত্রিম প্রজননের ধারণা (Concept of Artificial Reproduction)

আবাদি ফসলের উন্নয়ন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই। মানুষ তার চাহিদা পূরণের জন্য চারপাশের পরিবেশ থেকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় ভালো, সবল, সতেজ উদ্ভিদ নির্বাচনের মাধ্যমে ফসলি উদ্ভিদের উন্নয়ন কাজ শুরু করে। সে সময় মানুষের জ্ঞান ছিল অপরিণত, চাহিদাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। উন্নত শস্য জাত উৎপাদনের জন্য সচরাচর ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে (১) নির্বাচন, (২) সংকরায়ন বা কৃত্রিম প্রজনন, (৩) উদ্ভিদ প্রবর্তন ও (৪) মিউটেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন জাতে পরিদৃষ্ট প্রয়োজনীয় উন্নত বৈশিষ্ট্যসমূহের সন্নিবেশ ঘটিয়ে একটি নতুন ও উন্নত জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা ক্রমেই বাস্তবতা লাভ করতে থাকে। **বংশগতীয় পার্থক্য সম্পন্ন দুই বা ততোধিক জাতের উদ্ভিদের মধ্যে কৃত্রিমভাবে পরাগায়ন ঘটিয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্যের একটি নতুন জাত উৎপাদন পদ্ধতিকে কৃত্রিম সংকরায়ন বা কৃত্রিম প্রজনন বলা হয়।** এভাবে উৎপন্ন উদ্ভিদ জাতকে **সংকর** (hybrid) বলে। বর্তমানকালের অধিকাংশ উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাত কৃত্রিম প্রজনন বা সংকরায়ন পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশে কৃত্রিম সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল ধানের মধ্যে বি-আর-৮, বিআর-৯, বিআর-১০ (B-10) উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদ সংকরায়নের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রায় তিন হাজার বছর আগে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ও আরবদের মধ্যে অধিক ফলন লাভের আশায় খেজুর গাছের কৃত্রিম পরাগায়ন পদ্ধতি চালু ছিল। জার্মান বিজ্ঞানী Kolreuter (১৭৬০) সর্বপ্রথম সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভিদ উন্নয়ন শুরু করেন এবং অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মেন্ডেলের তত্ত্ব পুনঃআবিষ্কারের পর কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন জাতের ফসলের মধ্যে কৃত্রিম পরাগায়ন করে তাদের উন্নত বৈশিষ্ট্যসমূহ একজাতে সন্নিবেশিত করার প্রচেষ্টা বেগবান হয়।

প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্যে উদ্ভিদে কৃত্রিম সংকরায়ন তথা কৃত্রিম প্রজনন করা হয় —

১. একই জাতে সব ধরনের কাঙ্ক্ষিত ভালো গুণাবলির সন্নিবেশ করা।
২. বিভিন্ন চরিত্রের পুনঃসংযোজনের মাধ্যমে প্রজনকের বংশগতীয় ভেদ বৃদ্ধি করা।
৩. সংকরীয় সবলতা সৃষ্টি এবং তার ব্যবহার।

১০.৬ কৃত্রিম সংকরায়নের কৌশল (Techniques of Hybridization)

কৃত্রিম সংকরায়নের তথা কৃত্রিম প্রজনন বিভিন্ন ধাপ নিচে আলোচনা করা হলো —

১. **প্রজনক নির্বাচন :** প্রজনক হিসেবে ব্যবহারের জন্য এমন উদ্ভিদ নির্বাচন করতে হবে যাদের গুরুত্বপূর্ণ ভালো বৈশিষ্ট্য প্রচলিত জাতে অনুপস্থিত। নির্বাচিত উদ্ভিদ অবশ্যই নীরোগ এবং সবল হওয়া প্রয়োজন।

২. **প্রজনকের স্ব-পরাগায়ন :** বারবার স্ব-পরাগায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রজনকের বিশুদ্ধ সারি তৈরি করা প্রয়োজন হয়। এর ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য দূর হয় এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

৩. **ইমাস্কুলেশন :** উভলিঙ্গিক ফুলে পরাগ নির্গমনের আগে ফুলের পুংস্তবক অপসারণের প্রক্রিয়াকে ইমাস্কুলেশন বলে। স্ত্রী হিসেবে ব্যবহৃত প্রজনকের স্বপরাগায়ন রোধ করার জন্য ইমাস্কুলেশন করা হয়। সাধারণত ফুল ফোটার আগের দিন জীবাণুমুক্ত চিমটা ও নিডলের সাহায্যে পুংকেশর ছিড়ে ফেলে ইমাস্কুলেশন করা হয়। পরপরাগী ও একলিঙ্গিক ফুলে ইমাস্কুলেশন প্রয়োজন পড়ে না। ফুলের আকার খুব ছোট হলে ৪৫-৫০°সে. তাপমাত্রায় গরম পানিতে ১-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে ফুলের পুংকেশর নষ্ট হয় কিন্তু স্ত্রীকেশর অক্ষত থাকে। ধান, গম প্রভৃতিকে এভাবে গরম পানি বা অ্যালকোহলে ডুবিয়ে একক ফুল বা সম্পূর্ণ পুষ্পমঞ্জরি পুংবিহীন করা যায়।

৪. **ব্যাগিং :** ইমাস্কুলেশনকৃত ফুলকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরাগসংযোগ থেকে রক্ষার জন্য পাতলা পলিথিন বা কাগজের ব্যাগের সাহায্যে ঢেকে দেওয়াকে ব্যাগিং বলে। ইউক্লিপ বা সুতা দিয়ে ব্যাগটিকে আটকে রাখা হয় এবং শ্বসনের জন্য নিডল দিয়ে পলিথিনে কয়েকটা সূক্ষ্ম ছিদ্র করে দেয়া হয়।

৫. **পরাগরেণু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ :** ক্রসিং এ ব্যবহারের জন্য প্রজনকের পরাগরেণু সংগ্রহের প্রয়োজন পড়ে। ব্যাগকৃত পুংফুল ফোটার পর পরাগরেণু বা পরাগধানী পেট্রিডিশ বা কাগজের ব্যাগে সংগ্রহ করা হয়। অনেক সময় সংগৃহীত পরাগরেণু ছোট বোতলে ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যায়।

৬. **ক্রসিং :** নির্বাচিত প্রজনকের পরাগরেণু ইমাস্কুলেশনকৃত ফুলের গর্ভমুণ্ডে কৃত্রিমভাবে প্রতিস্থাপনকে ক্রসিং বলে। সংগৃহীত পরাগধানী ইমাস্কুলেশনকৃত ফুলের গর্ভমুণ্ডে অথবা তুলির সাহায্যে পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে ঘষে দেয়া হয়। ক্রসিং এর আগে ব্যাগ খুলে নেওয়া হয় এবং ক্রসিং এর পর ব্যাগ পুনঃস্থাপন করা হয়।

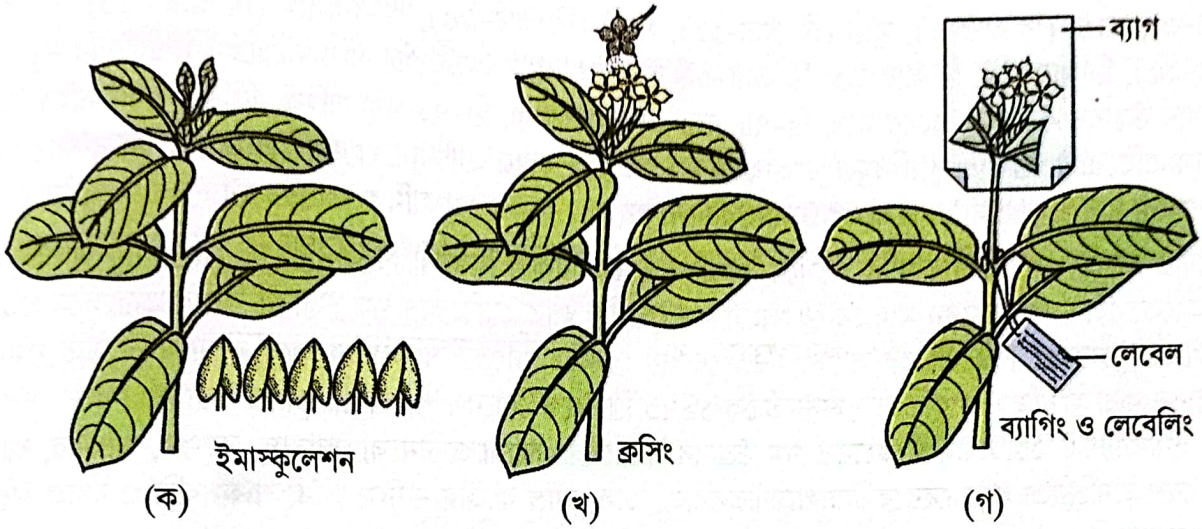

চিত্র-১০.১৬: সংকরায়ন

৭. **লেবেলিং :** ইমাস্কুলেশন ও ক্রসিং এর শেষে ফুল ব্যাগ দিয়ে ঢেঁকে দেওয়ার পর একটি ট্যাগে লেবেল লাগিয়ে দেয়া হয়। এই লেবেলে স্পষ্টভাবে পরিচিতি নং, ইমাস্কুলেশনের তারিখ, পরাগায়নের তারিখ ও পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়। লক্ষ রাখতে হয় যেন প্রাকৃতিক পরিবেশে লেবেল নষ্ট না হয়।

৮. **পরিপক্ক বীজ সংগ্রহ :** বীজ পরিপক্ক হলে লেবেলসহ কাগজের প্যাকেটে সংগ্রহ করা হয়।

৯. **F_1 জনু সৃষ্টি :** সংগৃহীত সংকর বীজ পরবর্তী মৌসুমে বপন করে F_1 উৎপন্ন করা হয়। F_1 উদ্ভিদ হতে পৃথক পৃথক প্যাকেটে স্বপরাগায়িত বীজ সংগ্রহ করে পর্যায়ক্রমে F_2, F_3, ... উৎপন্ন করা হয়। এদের মধ্য থেকে বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে উন্নত জাত বাছাই এবং পরবর্তীতে নতুন জাত রিলিজ করা হয়। এ পদ্ধতির জন্য ৭-১০ বছর সময় প্রয়োজন পড়ে।

সংকরায়ন পদ্ধতির সতর্কতা

১. ইমাস্কুলেশন ও ক্রসিং এর সময় হাত ও যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
২. ইমাস্কুলেশনের সময় গর্ভপত্রে যেন আঘাত না লাগে তা লক্ষ রাখতে হবে।
৩. ব্যাগিং সঠিকভাবে করতে হবে ও সূক্ষ্ম ছিদ্র করে দিতে হবে।
৪. পুংপ্রজনক সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে।
৫. সংকর বীজ সংগ্রহ ও বাছাই কার্যক্রম যথাযথ হতে হবে।

১০.৭ কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব (Importance of Artificial Reproduction)

বর্তমানকালে পৃথিবীর ক্রমবর্ধনশীল জনগোষ্ঠির খাদ্য নিশ্চয়তা প্রদান বিজ্ঞানীদের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাদি জমির পরিমাণ কমতে থাকায় এ সমস্যা অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করেছে। স্বল্প জমিতে ফসলের ফলন বৃদ্ধি ছাড়া এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের আশা অত্যন্ত ক্ষীণ।

আমেরিকান বিজ্ঞানী G.H. Shull (১৯০৮) ভূট্টার সংকর তৈরি করে ফসল উৎপাদনে চমক সৃষ্টি করেন। ইতোমধ্যে, তা বিভিন্ন ফসলের উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের ফসলের উন্নতজাত সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। ধান গবেষণার জন্য ফিলিপাইনে IRRI; ভূট্টা, গম, ট্রিটিসেল উন্নয়নের জন্য মেক্সিকোতে CIMMYT; কাসাভা ও

শিমজাতীয় ফসলের জন্য কলম্বিয়ায় CIAT; গোলআলু ও মিষ্টি আলুর জন্য পেরুতে CIP; মিলেটসহ ছোলা ও অড়হরের জন্য ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে ICRISAT স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BRRI; জয়দেবপুর), বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA; ময়মনসিংহ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI; জয়দেবপুর), বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI; ঈশ্বরদী), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI; ঢাকা), বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI; শ্রীমঙ্গল) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ফসলের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

BRRI থেকে ৭৮টি উফশী (উচ্চ ফলনশীল) জাতের ধান উদ্ভাবন করা হয়েছে। তার মধ্যে চান্দিনা (বি আর-১), বিপ্লব (বি আর-৩), আশা (বি আর-৮), মুক্তা (বি আর-১১), গাজী (বি আর-১৪), শাহীবালাম (বি আর -১৬), নয়া পাজাম (বি আর-২৫), ব্রি ধান-২৮, ব্রি আর-৩১, ব্রি আর-৩২ কৃষকের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সম্প্রতি ব্রি নতুন ১০টি জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে। এদের মধ্যে ব্রি-৭৮ বন্যা ও লবণসহিষ্ণু, ব্রি-৭১ খরা সহিষ্ণু, ব্রি-৭৩ লবণ সহিষ্ণু, ব্রি-৭৪ ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী, ব্রি-৭০ সুগন্ধিযুক্ত ও আকর্ষণীয়। গত ৪০ বছরে এশিয়ায় ধানের উৎপাদন ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। BARI থেকে ধান ছাড়া অন্যান্য ফসলের উন্নয়ন ঘটানো হয়।

গম পৃথিবীর অনেক দেশে প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। আমেরিকান বিজ্ঞানী Norman E. Borlaug জাপানি খাটো নোরিন জাতের জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে যে খাটো বসন্তকালীন জাত মেক্সিকান গম উদ্ভাবন করেন তার ফলে গম-চাষে এক বিপ্লবের সূচনা হয়। এ জাতের সাথে বিভিন্ন দেশের প্রচলিত জাতের সংকরায়ন করে নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ কৃতিত্বের জন্য তাঁকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ২১টি উফশী জাতের গম উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে বলাকা, আনন্দ, কাঞ্চন, আকবর, বরকত, সওগাত বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাছাড়া তৈলবীজ, ডাল, আঁশ জাতীয় ফসল, আখ, শাকসবজি ও ফলজ উদ্ভিদের উন্নয়নেও নানামুখী অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্বগুলো নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো—

১. **অধিক ফলন:** কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ধানের ফলন ৩ গুণ, ভূট্টার ফলন ৩.৫ গুণ, আলুর ফলন ২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (G.W. Burton 1992)।

২. **গুণগতমানের উন্নয়ন:** ফলনের পরেই ফসলের গুণগতমান বিচার করা হয়। যেমন- প্রোটিনের মাত্রা ও মান, স্টার্চের মাত্রা, তন্তুর দৈর্ঘ্য, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, রন্ধন উপযোগিতা প্রভৃতির পরিবর্তন করা হয়েছে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে। যেমন- করলার তিক্ততা হ্রাস পেয়েছে।

৩. **পরিপক্কতা কালের পরিবর্তন:** ভিন্ন ঋতুতে চাষ, অধিকাংশ ফসলের দ্রুত পরিপক্কতা লাভ, কোনো কোনো ফসল বিলম্বে হলে আমরা আর্থিকভাবে বেশি লাভবান হতে পারি। যেমন- গ্রীষ্মকালীন টমেটো, চিচিঙা প্রভৃতি কৃত্রিম প্রজননেরই ফল।

৪. **সমকালীন পরিপক্কতা লাভ:** সমকালীন পরিপক্ক ফসলের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক উপায়ে ফসল উত্তোলনে ব্যয় হ্রাস পায়। এমন ধরনের মুগ ডাল কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উদ্ভাবন হয়েছে।

৫. **কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন:** কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উদ্ভিদের খর্বতা (অড়হর, কার্পাস), জলাবদ্ধতা সহনশীলতা (দেশিপাট), শাখাহীনতা (পাট গাছ, কাঠ উৎপাদনকারী বৃক্ষ), বৃহদাকার দেহ (আমগাছ), আলোক সংবেদনশীলতা না থাকা (ধান, গম, ভূট্টা) বৈশিষ্ট্যগুলোতে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

৬. **রোগ প্রতিরোধী জাত উৎপাদন:** বিভিন্ন রোগ সংক্রমণের ফলে প্রচুর পরিমাণে আবাদি ফসলের ফলনহানী ঘটে। বুনো প্রজাতির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় সংকরায়নের মাধ্যমে এ বৈশিষ্ট্য আবাদি জাতে কৃত্রিমভাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী জাত উৎপাদন সম্ভব। গাজী (BR-14), মুক্তা (BR-11), মোহিনী (BR-15), শাহীবালাম (BR-16) প্রভৃতি ধানের রোগ প্রতিরোধী জাত।

৭. **পীড়ন সহনশীল জাত উৎপাদন:** খরা, লবণাক্ততা, জলমগ্নতা কৃষিতে বিরাট সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পীড়ন সহনশীল অর্থাৎ খরা, লবণাক্ততা, জলমগ্নতা সহনশীল জাত উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। লবণাক্ততা সহনশীল জাত (ব্রি-৪৭) উদ্ভাবন এক্ষেত্রে উপকূলবর্তী কৃষকের জন্য অত্যন্ত সুখবর হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

৮. **আবাদকাল সংক্ষিপ্তকরণ:** আমাদের দেশে বিল ও হাওড় অঞ্চলে আগাম বর্ষার কারণে অনেক সময় ফসল নষ্ট হয়। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে যদি ফসলের আবাদকাল সংক্ষিপ্ত করা যায় তাহলে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব। আশার কথা, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বেশ কিছু নতুন জাতের ধান আবিষ্কৃত হয়েছে যাদের জীবনচক্র প্রচলিত দেশীয় জাত অপেক্ষা ২০-৩০ দিন পর্যন্ত কম।

৯. **উদ্ভিদ বিবর্তন:** কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজাতি সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। যেমন— গম ও রাই এর সংকরায়নে ট্রিটিসেল উদ্ভাবন হয়েছে, যা স্বল্প শীত এবং প্রচণ্ড শীতে ভালো ফলন দেয়। তাই এটা ঐ অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ দানাশস্য হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

১০. **অধিক অভিযোজন ক্ষমতা:** বিচিত্র আবহাওয়া ও জলবায়ুতে জন্মাতে সক্ষম এমন উদ্ভিদ জাত সৃষ্টিতে কৃত্রিম প্রজনন বিশেষ অবদান রেখে থাকে।

১১. **হাইব্রিড ফল ও সবজি উৎপাদন:** কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে আম, তরমুজ, বরই, আপেলসহ মিষ্টি কুমড়া, লাউ, টমেটো, বাধাকপি ইত্যাদি সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে। বীজহীন ফল ও সবজি কৃত্রিম প্রজননেরই ফল।

বাড়ির কাজ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উদ্ভিদ সংকরায়নের গুরুত্ব উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

জনন	জীবের বংশধরের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষে নিজের অনুরূপ বংশধর সৃষ্টির পদ্ধতিই হলো জনন। জনন জীবের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।
যৌন জনন	দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামিটের (পুং ও স্ত্রীজনন কোষ) মিলনের মাধ্যমে যে জনন সম্পন্ন হয় তাকে যৌন জনন বলে। সপুষ্পক উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে যৌন জনন তথা বংশবৃদ্ধি ঘটায়।
ত্রিমিলন	ভ্রূণথলির ডিপ্লয়েড সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি হ্যাপ্লয়েড পুংগ্যামিটের মিলনকে ত্রিমিলন বলে।
নিষেক	গর্ভযন্ত্রে অবস্থিত নিশ্চল ডিম্বাণুর সাথে সচল শুক্রাণুর মিলনকে নিষেক বলে। নিষেকের মাধ্যমে আবৃতবীজী উদ্ভিদে বীজসহ ফল সৃষ্টি হয়।
অযৌন জনন	অযৌন জননের একক হলো রেণু বা স্পোর। রেণু বা স্পোরের মাধ্যমে উদ্ভিদের যে জনন ঘটে থাকে তাকে অযৌন জনন বলে। সাধারণত অপুষ্পক উদ্ভিদে অযৌন জনন ঘটতে দেখা যায়।
অঙ্গজ জনন	দেহের অংশবিশেষ হতে যখন সরাসরি নতুন বংশধর উৎপন্ন হয় তখন বলা হয় অঙ্গজ প্রজনন। অঙ্গজ প্রজননের ফলে বংশধরে মাতৃউদ্ভিদের গুণাবলি অপরিবর্তিত থাকে।
দ্বি-বিভাজন	এককোষী অণুজীব অনেক সময় সরাসরি বিভাজিত হয়ে দুটি কোষের জন্ম দেয়। একটি কোষ কোনো জটিলতা ছাড়াই সরাসরি দুটি কোষের জন্ম দেয় বলেই এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়া। ব্যাকটেরিয়াতে দ্বি-বিভাজন ঘটে থাকে।
পার্থেনোজেনেসিস	অনেক উদ্ভিদে নিষেক ছাড়াই ডিম্বাণু সরাসরি ভ্রূণ উৎপন্ন করে। নিষেক ক্রিয়া ছাড়া ডিম্বাণু হতে ভ্রূণ তৈরির প্রক্রিয়াই হলো পার্থেনোজেনেসিস।
অ্যাপোগ্যামি	ডিম্বাণু ব্যতীত ভ্রূণথলির অন্য যেকোনো কোষ থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মক্ষম বীজ সৃষ্টির প্রক্রিয়াই হলো অ্যাপোগ্যামি।
সংকরায়ন	বংশগতীয় পার্থক্য সম্পন্ন দুই বা ততোধিক জাতের উদ্ভিদের মধ্যে কৃত্রিমভাবে পরাগায়ন ঘটিয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্যের একটি নতুন জাত উৎপাদন পদ্ধতিকে সংকরায়ন বলা হয়।
ইমাস্কুলেশন	পরাগ বিসরণের পূর্বে ফলের পুংকেশর অপসারণের প্রক্রিয়াই হলো ইমাস্কুলেশন। এটি উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজননের একটি ধাপ।